পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং

সম্পাদনা

মধুময় পাল

সূচি

সম্পাদকের কথা ৯

তেতাল্লিশের মন্বন্তর: কালীচরণ ঘোষ ২৫

পঞ্চাশের মন্বন্তর: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫৮

পঞ্চাশের মন্বন্তর: গণহত্যার দলিল: নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ১০৪

বুভুক্ষু মেয়েদের জন্য 'মহিলা শিল্প ভবন': শান্তিসুধা ঘোষ ১২৮

শাল-মহুয়ার ছায়ায়: সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৩৩

'বেদনাদায়ক দৃশ্যগুলি': শ্যামাপ্রসাদের গ্রাম: চিত্তপ্রসাদ ১৪৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আকালের দিনগুলি: রমেশচন্দ্র চন্দ ১৫২

WHO CONTROLS THE CONTROL SHOP? :Alec Johnson ১৬৭

১৯৪৩-এর মন্বন্তর: একটি গোপন তথ্যচিত্রের সন্ধানে: বীরেন দাশশর্মা ১৮১

*বিমল রায়ের ছবির কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য স্থিরচিত্র/১৮৭

নবান্ন: মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৯৫

ক্ষুধার গান: অভীক চট্টোপাধ্যায় ১৯৭

মন্বন্তরের স্বরূপ ও 'আকালের দেশ': প্রভাতকুমার দাস ২১০

মৃণাল সেনের সিনেমা: মন্বন্তর ও বারুদঘর: মধুময় পাল ২২৮

সংবাদ সাহিত্য ২৩৯

দীপশিখা: দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৬

নমুনা: বনফুল ২৭৭

কন্ট্রোল: প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ২৮৪

বুভুক্ষু মানব: দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ২৮৮
পূজার প্রারম্ভে: নীলরতন দাশ ২৯২
জলতরঙ্গ: খগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৯৪
কাঁকরের হিসাব: ধীরেন্দ্রলাল ধর ৩০১
অভিমন্যু: মণীন্দ্র দত্ত ৩০৭
এই পৃথিবীর: প্রীতিকণা দেবী ৩১৪
জনরক্ষাবাহিনী: রাখালদাস চক্রবর্তী ৩২০
মৃত্যুর মহোৎসব: মুরারিমোহন সেন ৩২৩
ভারতীয় কৃষির অন্তর্জলি যাত্রা: সমর বাগচী ৩৩২
ভারতের কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থা:
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর: তুষার চক্রবর্তী ৩৩৮
ক্ষুধার বিশ্বে ভারত শীর্ষে: শঙ্কর সান্যাল ৩৪৯
'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়': সোমনাথ গুহ ৩৬২

পরিশিষ্ট

ঈশ্বরচন্দ্রর স্মৃতিরক্ষা: 'দুর্ভিক্ষ নিবারণী ভাণ্ডার': একটি প্রস্তাব ৩৬৯
বীরভূমে দুর্ভিক্ষ: নির্মলকুমার বসু ৩৭৩

লেখক পরিচিতি ৩৭৭

সম্পাদকের কথা

'আমাদের ইতিহাসে চিহ্ন দিক ক্ষুধিত জঠর'
জঠর, অরুণ মিত্র

এক কী দেড় বছরে, অবিশ্বাস্য হলেও এটা ঘটনা, মাত্র এক কী দেড় বছরে, বাংলা সন ১৩৫০-৫১, ইংরেজি ১৯৪৩-৪৪, বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ কৃষিজীবী ও কারিগর নিহত হলেন। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও চরম অপশাসন এবং এদেশের বেনিয়াতন্ত্রের ভয়ংকরতম ষড়যন্ত্রে। এই বেনিয়াতন্ত্র আজকের প্রচলিত পরিভাষায় 'ফুড মাফিয়া'। যাঁরা আমাদের অন্ন জোগান, আমাদের জীবনধারণকে স্বচ্ছন্দ রাখেন, আমাদের সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করেন, অনাহারে অর্ধাহারে বিনাচিকিৎসায় কাতারে কাতারে তাঁরা মারা গেলেন।

অবিভক্ত বাংলার জেলায় জেলায় এই জেনোসাইড, এই গণহত্যা বাংলা লেখায় তেমন এল কই! গোটা কয়েক উপন্যাস, কয়েকটি গল্প আর কিছু কবিতায় ফুরিয়ে গেল এই হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা, হিংস্রতা, লোভ-লালসা- রাজনীতির দস্যুতা আর লক্ষ লক্ষ মানুষের অপরিমেয় দুর্দশার কথা। বাঙালির মন ও কলম বড়ো নরম, দুঃখকষ্টের কঠিন বাস্তব তার ধাতে সয় না। লঘু জলসা তার প্রিয় অবগাহন। মৃত্যুআকীর্ণ সেই দিনগুলি রাতগুলি, রাজপথে গলিপথে দুয়ারে জানালায় অস্থিসার মানুষের মিছিলের ক্ষুধার কান্নার অনিঃশেষ রোল, লঙ্গরখানায় মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা, অন্যদিকে লালসা ও কর্তৃত্বের নির্লজ্জ আস্ফালন, আরও কত শত সামাজিক উপদ্রব— রচিত হতে পারত বাংলার সর্বনাশের অজস্র ভাষাসৌধ। লিখিত হতে পারত কথাশিল্পের আধারে ইতিহাসের অসংখ্য *আনন্দমঠ*। হয়নি। দেশভাগ-দেশত্যাগ নিয়ে নির্বিকার থেকে বাংলা সাহিত্য যেমন নিজেকে দরিদ্র করেছে, একইভাবে সে নিজেকে গরিব করেছিল পঞ্চাশের আকাল সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে।

নিহতের সংখ্যা ৫০ লক্ষ। নিশ্চিতভাবেই এটা শিহরন-ধরানো সংখ্যা। তবু এই সংখ্যা সামগ্রিক সর্বনাশের ছবিটা ধরতে পারে না। বাংলার আবহমান জীবনযাপন ধ্বংস হয়ে গেল। নীতি-নৈতিকতা, সম্পর্কের পবিত্রতা ও নির্ভরতা, মূল্যবোধ, সমাজের মানববন্ধন,

জীবনের তাৎপর্য সব তছনছ হয়ে গেল। আগামীতে আরও লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর পরিস্থিতি প্রস্তুত হল। দুঃসহ দুর্দশার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে পড়ল বাংলা।

ফরিদপুরের ছোটো বাড়িতে ফুলের চারা আর শাকসবজি দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যে আচারশীলা মাতৃরূপিণী পিসিমা, লাজুক একটা সদ্য-ফোটা ফুলের মতন কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মতো নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, নুটু, মীনুদের যে চমৎকার পরিবারযাপনের ছবি ছিল, শহরে বাঁচতে এসে তা চুরমার হয়ে গেল। কেন মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটল এমন করে? কোন দয়াহীন দস্যুতা এর জন্যে দায়ী? প্রশ্ন করেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল 'অঙ্গার' গল্পে। শোভনা চিৎকার করে মা-র দিকে পরপর প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়: মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায়? হরিশ যোগেনদের কাছে কে পাঠিয়েছিল মীনুকে? আমাকে কেরানিবাগানের বাসায় কে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল? হোটেলের পাউরুটি আর হাড়ের টুকরো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি?

এই ছবি বলে দেয় কীভাবে সর্বনাশ ঢুকেছিল বাংলার ঘরে ঘরে। কন্যাদের যৌনজীবিকার পথে ঠেলে দেন জননী পুত্রকে এঁটো কুড়োনোর পথে। মৃতের সংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক বৃহৎ এই নৈতিক অপমৃত্যুর এলাকা।

কিছু লেখা হয়েছে তো নিশ্চয়, অবিস্মরণীয় কিছু, সে-সবও দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছে দীর্ঘকাল আগে। বাংলা ও বাঙালির কার্যত উদ্ধারহীন বিপর্যয়ের ইতিহাস কি হেলায় হারিয়ে যাবে? এই প্রশ্নে আমাদের স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল 'না'। তৈরি হয়েছিল সংকলন 'ক্ষুধার্ত বাংলা: রাষ্ট্র ও বেনিয়াতন্ত্রের গণহত্যার দলিল'। সাল ২০১৩। সে-সময় দুষ্প্রাপ্য এবং বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার, প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ করি। একটা বিষয় আমাদের নজরে পড়ে, বহু মানুষের স্মৃতিকথায় পঞ্চাশের মন্বন্তর-প্রসঙ্গ আছে। কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও একটু বিশদে। এই অংশগুলি বস্তুত দলিল, ইতিহাস এখানে কথা বলছে। এরকম লেখা যত বেশি সম্ভব সংগ্রহ করা জরুরি বলে বিশ্বাস করি। গল্পে-আখ্যানে যা লেখা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাষ্য পাওয়া যাবে এইসব লেখায়। পাওয়া যাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপলব্ধি।

বাংলা সাহিত্যের প্রণম্য ইতিহাসকার সুকুমার সেনের স্মৃতিচারণা থেকে জেনে নিতে পারি তাঁর অনুভব। 'দিনের পরে দিন যে গেল'-য় তিনি লিখছেন, 'কলকাতায় পড়তে আসবার পর থেকে অনেক ছোটো-বড়ো হাঙ্গামা দেখেছিলুম। নন-কোঅপারেশনের ধরনা, দিনু মিঞার মসজিদকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দীর্ঘ ট্রাম স্ট্রাইক। কিন্তু সব হাঙ্গামাকে টেক্কা দিয়েছে দুটি, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ আর ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা অধিবাসের তুমুল হত্যাকাণ্ড। দুটি ঘটনাই রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ঘটেছিল।

প্রেতকল্প শীর্ণকায় ক্ষুধাতুর অগণিত মানুষের একঢোক ফেন বা একমুঠো অন্নের প্রত্যাশায় কলকাতায় আগমন আর দলে দলে রাজপথে মরে পড়ে থাকার দৃশ্য আর কাউকে যেন স্বপ্নেও না দেখতে হয়। সে দৃশ্য দেখে মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার

বড়াই মিথ্যাবাদ বলেই প্রতিপন্ন হয়েছিল। কী সাংঘাতিক উপলব্ধি। ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ তখন বেঁচে নেই।'

রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট শিল্পী ও বামপন্থী সংস্কৃতি-কর্মী কলিম শরাফী 'স্মৃতি অমৃত'-য় লিখেছেন, 'না খেতে পেয়ে যাঁরা মৃত্যুর শিকার হচ্ছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই মধ্য ও ভূমিহীন কৃষক। জোতদার ও মহাজনের হাতে লুণ্ঠিত হয়ে সপরিবারে যাত্রা শুরু করলেন তাঁরা দুমুঠো ভাতের আশায়। অনেকে পথেই মারা গেলেন, যাঁরা বেঁচে থাকলেন তাঁরা শহরের লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খেয়ে কিছুদিন বাঁচলেন। দীর্ঘদিনের উপবাসের পর খেতে গিয়েও অনেকে মৃত্যুবরণ করলেন। আর পরিবারের যুবতী মেয়েরা নারী ব্যবসায়ী দালালদের শিকার হলেন। অনেক মা শিশুকে ফেলে উধাও হয়ে গেলেন পেটের জ্বালায়। অনেক শিশু প্রাণে বাঁচল কোনো দয়ালু ব্যক্তি, ধর্মীয় সংগঠন ও সমাজসেবী সংস্থাগুলির সাহায্যে। আবার অনেকে পশুপক্ষীর খাদ্যেও পরিণত হয়েছে।

অনেক পণ্ডিতের মন্তব্য শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি যে, শুধু যুদ্ধের কারণেই বার্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি। সারা ভারতবর্ষে পঞ্চাশ লক্ষ লোককে বাঁচানোর মতো খাদ্যশস্য ছিল না? ছিল, তবে তা এমন এক লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল যে অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ লোক না মারলে মহাজন ও চোরাব্যবসায়ীরা অর্থের পাহাড় গড়তে পারত না। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত কিছু ধনকুবেরকে আজও এই বাংলাদেশের মাটিতে দেখতে পাওয়া যায়। অবিভক্ত বাংলায় তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা বিরাজ করছিল। এই ধনকুবেররা তাদেরই স্নেহস্পর্শে লালিত পালিত। দুর্ভিক্ষে মানুষ ব্যবসায়ে এঁরা অংশীদার ছিলেন। পরে অবশ্য বহুবার হজ করে, দান-খয়রাত করে, হাসপাতাল, এতিমখানা ও স্কুল বানিয়ে তাঁরা মানুষ হত্যার শুদ্ধি করেছেন।'

কলিম শরাফী মাত্র দুটো অনুচ্ছেদে ক্ষুধাপীড়িত মানুষের দুর্দশার ছবির সঙ্গে চিরায়ত মানবিক সম্পর্কের বিনাশ এবং কালোবাজার ও রাজনীতির মাফিয়াদের দুষ্টচক্রের ইতিহাস অকপটে তুলে ধরেছেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের চিরস্মরণীয় অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র আকালের দিনে লঙ্গরখানায় স্বেচ্ছাসেবা করেছেন। তাঁর একটি দিনের অভিজ্ঞতা পড়া যেতে পারে: 'একদিন একটি বউ লাইনে বসে আছে। বউ— হ্যাঁ বউ; কঙ্কালসার হাতে ওই শাঁখা দুটো আর ছেঁড়া কাপড়ের ঘোমটাটাই তো তার প্রমাণ। সিঁদুর খুব লক্ষ করলে হয়তো বোঝা যায়। নতুন সিঁদুর দেবার তো ওর সুযোগ হয়নি। হ্যাঁ, সেই বউটি কেমন যেন করতে লাগল। আমরা দু-একজন দৌড়ে সেদিকে গেলাম। পাশের লোকটি বলল, বেশ নিস্পৃহ গলায় বলল, 'ও বাঁচবেনি'। এখন সবে ফার্স্ট এইড ট্রেনিং নিয়েছি। নাড়ি দেখলাম, আমার স্বল্প অভিজ্ঞতাতেই বুঝলাম, শেষ হয়ে আসছে।... অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই... আমারই হাতের ওপর...।' কে জানে এই মৃতের পরিচয়। এদের একটাই পরিচয়— ডেস্টিটিউট। ১৯৪৭-এর পর যেমন রেফিউজি।'

আর-একদিন তাঁর তিনতলার ঘরের জানালা দিয়ে একটি দৃশ্য দেখেন তৃপ্তি মিত্র। বাড়ির উলটোদিকে ফুটপাথে একটা ডেস্টিটিউট পরিবার থাকত। একতলা থেকে ফ্যান দেওয়া হচ্ছে দেখে ওরা ছুটে আসে। ফ্যানের টিন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কঙ্কালসার মায়ের হাতের চড় পড়ে কঙ্কালসার মেয়ের গালে। আরও ছোটো চামড়াঢাকা কঙ্কালগুলো ভয়ে সরে গেল। মা এক নিশ্বাসে ফ্যান খেতে লাগল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আকালের পেট থেকে কিছু শব্দ জন্ম নিল। আজও তারা ব্যবহারিক ভাবে বেঁচে আছে বাংলায়— 'কালোবাজার', 'কৃত্রিম অভাব', 'লপ্‌সি', 'লঙ্গরখানা'।

'লঙ্গরখানা' নামে গল্প লিখেছেন আবুল মনসুর আহমদ। গল্পটি ভীষণভাবে সাম্প্রতিক। ধান-চাল কেনার সরকারি লাইসেন্সহোল্ডার যারা কার্যত ফুড মাফিয়া, খাদ্য সমস্যা গল্পটি বলে, শাসক ও ফুড মাফিয়ারা নির্লজ্জ সম্পর্কে বাঁধা বা অবাঙালি উচ্চারণে 'খাদিয়া সমুসা', চোরাকারবার, সরকারের অপদার্থতা ও অলীক প্রতিশ্রুতি, লঙ্গরখানার নামে মানুষের চরম অপমান—গল্প জুড়ে আছে এইসব। খাজা নাজিমউদ্দিন ও সুরাবর্দির সৌজন্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্টরা লাখ লাখ মানুষকে না খাইয়ে মেরেছিল সেদিন। সাম্প্রতিক অতীতে কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইন সেই পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কৃষকরা এবং জয়ী হয়।

গল্পে ওজির চরিত্রটি বলে: লঙ্গরখানা। হাম লঙ্গরখানা খুলাইবে। তামাম মুলুকমে হাম লঙ্গরখানা ওপেন করাবে। দেশকে হামি লঙ্গরখানা দিয়ে ছাইয়া ফেলবে। সারা বাঙ্গালাকো হাম লঙ্গরখানা বানাকে ছাড়বে। দেখবে হাম কোন বেটা চাউঅল না খেয়ে থাকে।

ক্ষুধার্ত মানুষকে ভিখারি বানিয়ে মেরে ফেলার চক্রান্ত। এই সংকলনে 'লঙ্গরখানা' গল্পটি নেই, ক্ষুধা ও লঙ্গরখানা আছে। কিছু গ্রন্থিত ও পঠিত, কিছু দুষ্প্রাপ্য ও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা আখ্যান ও স্মৃতিকথার সম্মিলনে আমরা নির্মাণ করতে চেয়েছি পঞ্চাশের আকালের নিবিড় কথাকূট, যেখানে ইতিহাসের কণ্ঠস্বর জেগে আছে।

মনে পড়ছে প্রখ্যাত চিত্রকর শ্যামল দত্তরায়ের স্মৃতিচারণা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'দুর্ভিক্ষের সময় আমার বয়স প্রায় দশ। স্কুলে পড়ি। কলকাতার পথে পথে তখন ফ্যান চেয়ে ঘুরছে হাজার হাজার মানুষ। সামনের গাড়ি-বারান্দার নীচে রোজ মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি। আমাদের পরিবার ফ্যান দিতে পারেনি। দেবার সাধ্য ছিল না। কালোবাজারের চাল কেনার টাকা ছিল না বাবার। তিন ভাই রেশনের লাইনে দাঁড়িয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বড়োদের গা-জোয়ারি ছিটকে দিয়েছে তিন শিশুকে। খালি হাতে বাড়ি ফিরেছি। যুদ্ধফেরত পচা আটা সস্তায় কিনে খিদে নিবারণ হয়েছে তখন। অথচ এই বাড়ির পাশেই এক স্বামীজির আশ্রমের উঠোনে রাশি রাশি চালের বস্তা লাট লাগানো থাকত। রান্নাবান্নার সুগন্ধ আসত জানালা দিয়ে। স্বামীজির চ্যালাচামুন্ডা ও ভক্তরা চকচকে চেহারা নিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করত। আমার ছবিতে যে ক্ষোভ রাগ যন্ত্রণা তা ওই দুর্ভিক্ষের সময় থেকেই মজুত হয়েছে।' প্রসঙ্গত, শ্যামল

দত্তরায়ের 'ব্রোকেন বৌল' সিরিজ ক্ষুধার চিত্রমালা। সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় ১৯৯৯-এ; পঞ্চাশের মন্বন্তরের ৫৬ বছর পর। তাঁর স্মৃতিতে তখনও জীবন্ত আকালের দিনগুলি।

ফ্যাশনেবল লোকের ভিড় ঘোড়দৌড়ের মাঠে

পঞ্চাশের আকালের দায় বিদেশি রাষ্ট্রযন্ত্রের যতটা, ততটাই দেশি বেনিয়াতন্ত্রের। এই বেনিয়াদের মধ্যে ছিল ইস্পাহানি ও হনুমান বক্স। এরা সরাসরি মদত পেয়েছে বাংলা-শাসক খাজা নাজিমাউদ্দিন ও সুরাবর্দির। ধান-চাল সংগ্রহের নামে বেলাগাম মুনাফার লাইসেন্স দেওয়া হয় এদের। পঞ্চাশের আকাল নিয়ে চর্চায় এদের নাম ইতিমধ্যে অনেকেরই জানা হয়ে গিয়েছে। অনেক নাম আড়ালে আছে। যেমন শ'ওয়ালেস, জয়রামদাস দৌলতরাম। এছাড়াও বাংলার জেলায় জেলায় এবং বাংলার বাইরে ইস্পাহানি-হনুমান বক্সদের নানা নামের এজেন্ট-সাবএজেন্ট। সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা এই বেনিয়ারাই চোরাকারবারের উৎসমুখ এবং গণবিনাশের পুরোহিত। এরা অসহায় ও অভাবী চাষির ঘর থেকে চাপ দিয়ে ও লোভ দেখিয়ে শস্যসংগ্রহ করেছে। সরকারের নামে সংগ্রহ করে মজুত রেখেছে নিজের গোলায়। গোলার সংখ্যা বাড়িয়েছে। সরকারের ঘরে চাল পৌঁছে দেয়নি। দ্বিগুণ/তিনগুণ বাড়তি দামে বাজারে বেচেছে। অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরে ইস্পাহানির চিফ এজেন্ট ছিল রামপ্রতাপ মুণ্ডা নামের এক মারোয়াড়ি। সে সংগৃহীত ধান-চাল নিজের মজুতে রেখে দেয়। কালিয়াগঞ্জ সদরের বিজয় সিংও একই কর্ম করে। মুসলিম লিগ সরকারের সৌজন্যে এভাবে চোরাকারবার ফুলেফেঁপে ওঠে। সংগৃহীত ধান-চাল সুরক্ষিত রাখবার জন্য এরা 'সিরিজ অফ গোডাউন্স' তৈরি করেছিল। বিশাল জায়গা জুড়ে এক-এক সারিতে ১৫/১৬টি করে গোলা। এরকম দুটো বা তিনটে সারি। অর্থাৎ এক জায়গায় তিরিশ বা পঞ্চাশটি গোলা। দিনাজপুরের বড়োমাঠে এবং বাঙালবাড়ি রেলস্টেশনে সার সার গোলা তৈরি হয়েছিল। এইসব গোলায় ধান-চাল যেটুকু মজুত হয়, তা সরকারের সদিচ্ছার অভাবে ও মজুতদারদের চক্রান্তে বিলিবণ্টন করা যায়নি। আকালের চরম অবস্থায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় গোলার ধান স্থানান্তরিত করবার চেষ্টা হলে কৃষক সংগঠনের কর্মীরা রুখে দাঁড়ায়। তারা ন্যায্যমূল্যে ধান-চাল বিলির দাবি জানায়। কোথাও কোথাও দাবি মানা হয়েছিল। বহু জায়গায় হয়নি। পরিস্থিতি বিচার করে জনসংহতির আবেদন নিয়ে দিনাজপুরে ছুটে যান সরবরাহ মন্ত্রী সুরাবর্দি। বড়োমাঠের জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে সরবরাহ মন্ত্রী বলে আপনারা জানেন। আসলে আমি সর্বহারাদের মন্ত্রী। মানুষের সেবা করার জন্য আল্লাহর কাছে শক্তি কামনা করি।' কথার চাতুর্যে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর খেলার ট্রাডিশন বেশ প্রাচীন এই বাংলায়। আকালের দিনেও তার আকাল হয়নি।